শান্তিনিকেতনকে মানতে হবে অনেক বিধিনিষেধ, দীর্ঘ লড়াই শেষে ‘ইউনেস্কো হেরিটেজ’, এলাকা কতটা?

পিনাকপাণি ঘোষ

স্বীকৃতি মিললে তার চাপও থাকে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর, বেশ কিছু বিধিনিষেধ বা নিয়মকানুনের চাপে পড়তে হল শান্তিনিকেতনকেও। শান্তিনিকেতন বললে একটা বিস্তৃত পরিসর বোঝায়। যা মূল শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়েও চার পাশে অনেকটা ছড়িয়ে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পরিসর সেই বিরাট শান্তিনিকেতনের কিছু নির্দিষ্ট অংশ।

কী কী পড়ছে সেই ঐতিহ্যক্ষেত্রে? ইউনেস্কো যে এলাকা ঠিক করে দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আশ্রম ভবন, কলা ভবন, সঙ্গীত ভবন, উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণের মধ্যেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ উদয়ন, উদীচী, শ্যামলী, পুনশ্চ, কোনার্ক। এ ছাড়াও উপাসনা গৃহ, ছাতিমতলা সবই ঐতিহ্যের তালিকায়। মুক্ত বিদ্যালয় বসে যে সব জায়গায়, তা-ও এই ক্ষেত্রের মধ্যেই পড়ছে।

বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণ। ছবি: সংগৃহীত।

শান্তিনিকেতনের এই স্বীকৃতি পাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে বহু কালের লড়াই। বহু চেষ্টা। বহু মানুষের উদ্যোগ। তাঁদের মধ্যেই এক জন সংরক্ষণ-স্থপতি মণীশ চক্রবর্তী। কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে শান্তিনিকেতনকে, আনন্দবাজার অনলাইনকে তা জানালেন মণীশ। তাঁর কথায়, “শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য যেমন ছুঁয়ে দেখার, তেমন অনুভবেরও। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও দর্শন যেমন ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনই তাঁর নিজের এবং

সহযোগীদের সৃষ্টি রয়েছে। সেটা যেমন কোনও ভবন, তেমনই ভবনের অন্দরসজ্জাও। আবার যে সব গাছ, বাগান, জলাশয় রয়েছে সেগুলিও ঐতিহ্যের মধ্যে। সবটাই যেমন ছিল, যেমন রয়েছে, তেমন ভাবেই সংরক্ষণ করতে হবে। কোনও বদল আনা যাবে না।” মণীশ আরও জানান, “একবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য রয়েছে এই সব ভবনে। যেখানে জাপান, চিন, বর্মার মতো দেশের স্থাপত্যের চর্চা হয়েছে। আবার শান্তিনিকেতনের ইট-কাঠ-পাথরে অথবা গাছের প্রতিটি পাতায় জড়িয়ে রয়েছে কবিগুরুর দর্শন। আমরা এগুলিই ইউনেস্কোকে জানিয়েছিলাম। এখন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হয়ে গেল এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখা।” মণীশ জানিয়েছেন, মৌলিক কাঠামো (অথেন্টিসিটি) বজায় রেখে এ সবের সংরক্ষণ করতে হবে। জানলা, দরজা কিছু মেরামত করতে হলে তাতে কোনও বদল আনা যাবে না। নকশার তো নয়ই, যা দিয়ে তৈরি তাতেও বদল নয়। কোনও গাছ বদলে দেওয়া যাবে না। এমনকি কোনও অনুষ্ঠানে কেমন ভাবে আলপনা দেওয়া হবে, কেমন করে শঙ্খ বাজানো হবে, তাতেও শান্তিনিকেতনের বিশুদ্ধতা (ইন্টিগ্রিটি) মেনে চলতে হবে। এই এলাকায় কোনও নতুন নির্মাণও চলবে না।

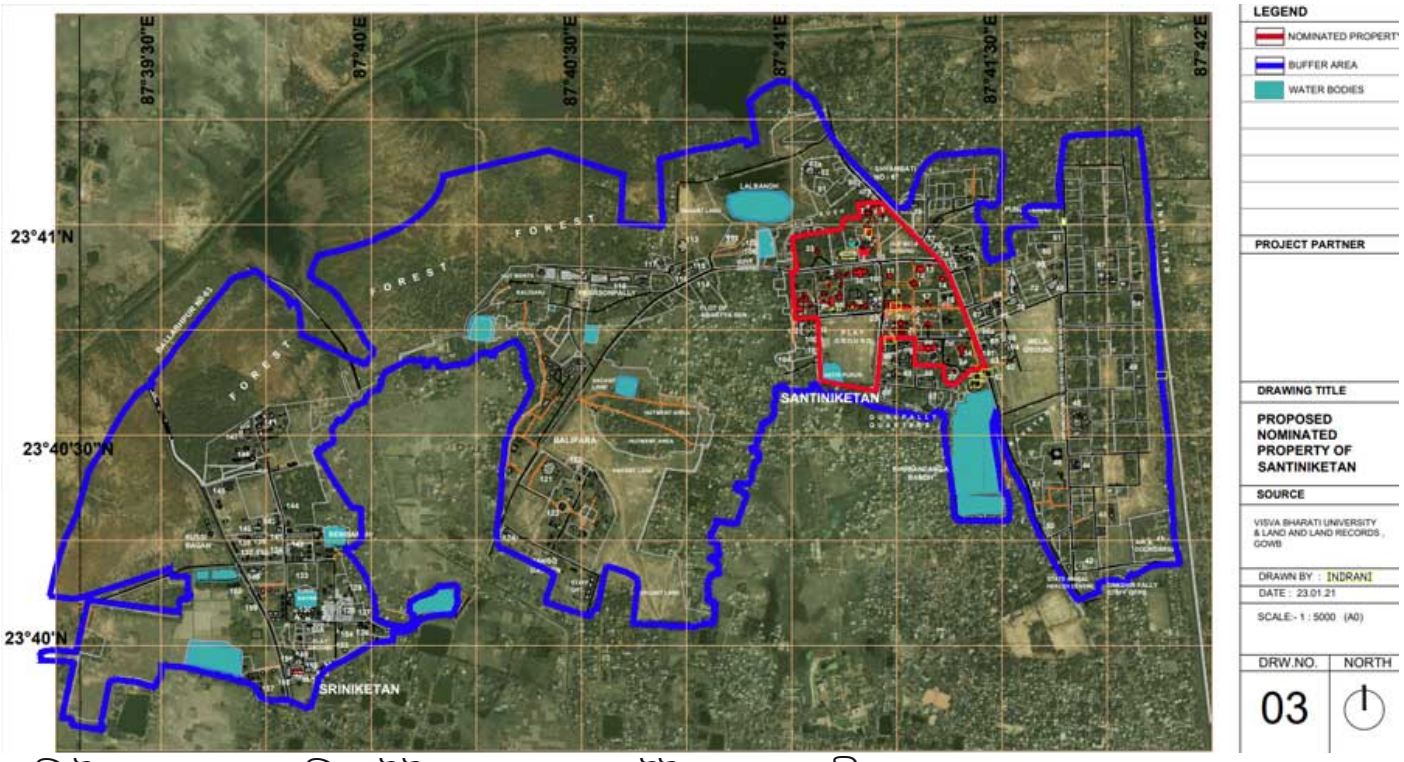

হেরিটেজ এলাকার মানচিত্র। ইউনেস্কোর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মূল এলাকার বাইরের যে অংশ, অর্থাৎ বিশ্বভারতীর অধীনস্থ বাকি এলাকায় কিছু ছাড় রয়েছে। এই এলাকায় মূলত রয়েছে খেলার মাঠ, পড়ুয়াদের হোস্টেল। সেখানে আগামী দিনে প্রয়োজনে নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে কেমন হবে সেই নির্মাণ, তা-ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এর জন্য নতুন কমিটি তৈরি করতে হতে পারে বিশ্বভারতীকে। যা খুশি করা যাবে না। প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করতে হবে ঐতিহ্য মেনে। ঐতিহ্যশালী স্থাপত্যের কোনও ক্ষতি হয়, এলাকাকে এমন দূষণ থেকে দূরে রাখার ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। এর জন্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কথাও বলে দিয়েছে ইউনেস্কো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪০ সালের ১৯ ফেব্রিয়ারি গান্ধীজিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ‘মহাত্মাজি’ সম্বোধন করে শান্তিনিকেতনকে রক্ষার আর্জি জানিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, তাঁর গোটা জীবনের আহরণ, সঞ্চয় যেন সুরক্ষা পায়। গান্ধীজি পত্রপাঠ জবাবে ‘গুরুদেব’কে জানিয়েছিলেন, বিশ্বভারতী শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কথা দিয়েছিলেন তাঁর সামর্থ মতো চেষ্টা করার।

১৯৪০ সালের সেই পত্রালাপের কথা ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে মনে করাচ্ছেন শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কোর বিশ্ব

ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত করার লড়াইয়ের সৈনিকেরা। বলছেন, এ বার স্থায়ী সংরক্ষণের সুবিধা মিলবে। রবিবারই মিলেছে সুখবর। সৌদি আরবের রিয়াধে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সভায় শান্তিনিকেতনের স্বীকৃতি ঘোষণা হয়েছে। এখন থেকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত বাংলার শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনের বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা পাওয়ার লড়াই কম দীর্ঘ নয়। প্রায় দু'দশক ধরে চলেছে আবেদন, নিবেদন। চলেছে আইন-আদালতও। বড় আকারে যুদ্ধটা শুরু হয় ২০১০ সালে। সেটাও শেষে ভেস্তে যায়। ২০২১ সালে নতুন করে যে উদ্যোগ, তাতেই এল সাফল্য। একটা সময়ে চাওয়া হয়েছিল গোটা শান্তিনিকেতন শহরই আসুক ঐতিহ্যের তালিকায়। তবে তা হয়নি। এ বার ইউনেস্কো চিহ্নিত করে দিয়েছে কোন এলাকাকে হেরিটেজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে আশ্রম এলাকা, উত্তরায়ণ, কলা ভবন এবং সঙ্গীত ভবন। এখানে রয়েছে ৩৬ হেক্টর জমি (নমিনেটেড প্রপার্টি)। এর বাইরেও একটা বর্ধিত অংশ (বাফার জোন) রয়েছে। ইউনেস্কো জানিয়েছে, সবটা মিলিয়ে ৫৩৭.৭৩ একর এলাকাই বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত।

শান্তিনিকেতনের এই মর্যাদাপ্রাপ্তির লড়াইটা শুরু হয়েছিল ২০০৩ সাল নাগাদ। এর পরে ২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। সেই সময়ে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, মৃণাল সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন-সহ অনেক বিশিষ্টেরই সমর্থন ছিল। তখনকার কাহিনি শোনালেন এই লড়াইয়ের অন্যতম সৈনিক বিজ্ঞানী পার্থসারথি ঘোষ। তিনি বলেন, "সেই সময়ে শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ (এসএসডিএ) ও একটি বেসরকারি সংস্থা যৌথ ভাবে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লির পাশে ৯ একর জমিতে আবাসন প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই শুরু হয়।" প্রসঙ্গত, সেই সময়ে এসএসডিএ-র চেয়ারম্যান ছিলেন সিপিএম সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিতর্কের মধ্যেই লোকসভার তৎকালীন স্পিকার সোমনাথ ওই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। মামলা কলকাতা হাই কোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায়। পার্থসারথি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, শান্তিনিকেতনে যা কিছুই করুন না কেন, এমন কিছু করা চলবে না যা কিনা কবিগুরু ফিরে এলে চিনতে পারতেন না।"

তখন থেকেই চলতে থাকে উদ্যোগ। নাছোড় মহাশ্বেতা দেবী বাংলার তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর কাছেও দরবার করেন। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লড়াইয়ে রাজ্যপালেরও যোগ ছিল বলে জানিয়েছেন পার্থসারথি। ইউনেস্কোর ঘোষণার পরে আনন্দবাজার অনলাইনের পক্ষে যোগাযোগ করা হয়েছিল গোপালকৃষ্ণের সঙ্গে। ব্যস্ততার জন্য তিনি বিস্তারিত কথা বলার অবকাশ পাননি।

তবে প্রথম থেকে এই লড়াইয়ে থাকা রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার খুবই খুশি ইউনেস্কোর ঘোষণায় । ২০১০ সালে যখন ইউনেস্কোর কাছে প্রথম বার আবেদন করা হয়, তখন তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিসচিব। জহর বলেন, "ইউনেস্কো তখন কতগুলি প্রশ্ন তুলেছিল। শান্তিনিকেতনের যে এলাকাকে আমরা ঐতিহ্য বানাতে আবেদন করেছিলাম, তার অনেক মালিকানা ছিল। পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার— বিভিন্ন মালিকানার জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইউনেস্কো। শান্তিনিকেতনের এলাকায় বেশ কিছু নির্মাণ কাজও ঐতিহ্য বিরোধী বলে ওঁরা আপত্তি করেন।" ২০২১ সালে নতুন করে আটঘাট বেঁধে শান্তিনিকেতনের জন্য আর্জি জানানো হয়। তখন শুধুমাত্র বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ৩৬ হেক্টর জমিই ঐতিহ্যক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করে আর্জি জানানো হয়। ওই এলাকার মালিকানা শুধু বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের হাতেই রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রথমে যে আবেদন করা হয়েছিল, তাতে বেশি করে রবীন্দ্রনাথের কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু তাতে ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় দফার যে আবেদন, তাতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এবং সৃষ্টি, শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য, ভাস্কর্যের উপরে জোর দেওয়া হয়।২০০

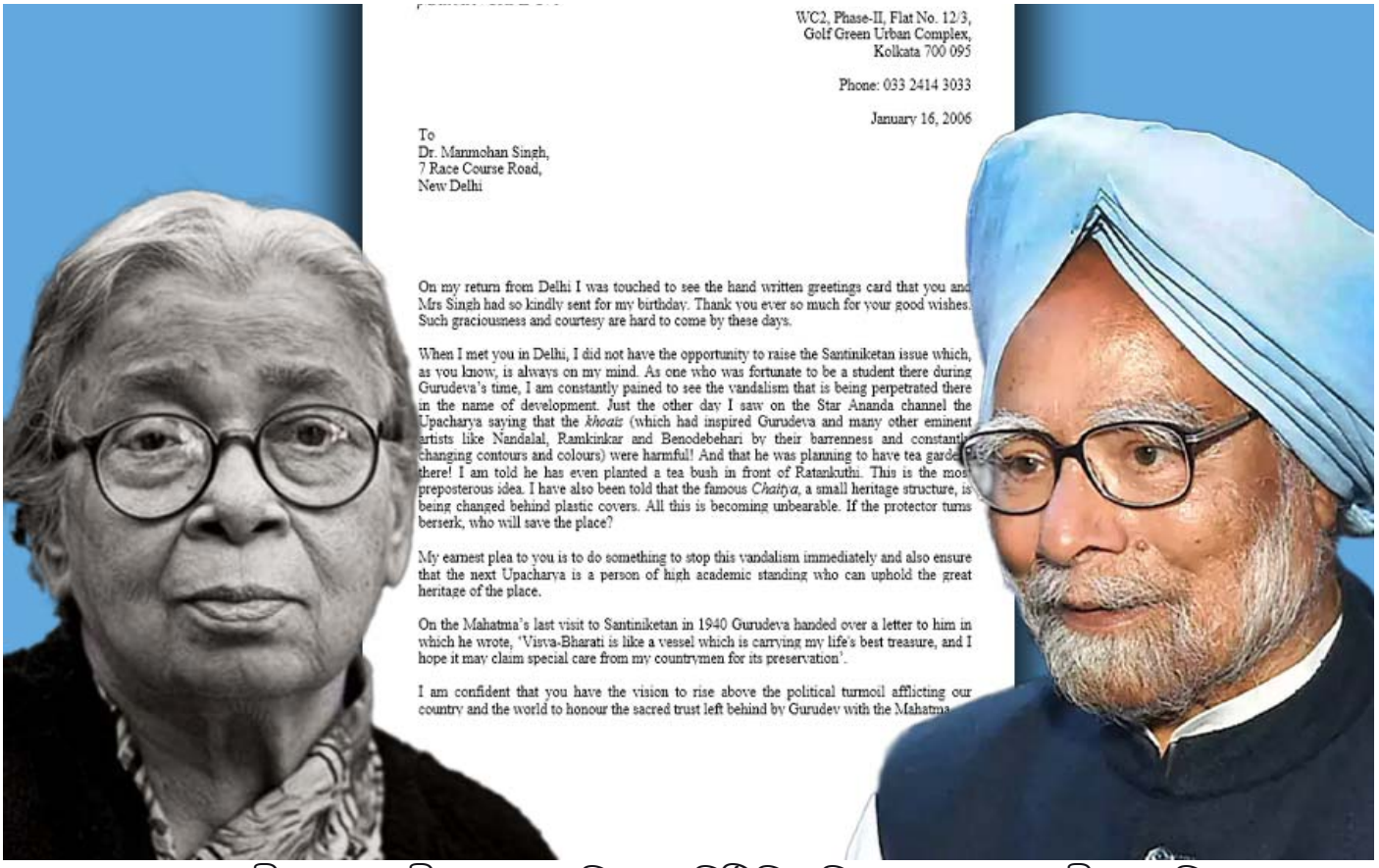

২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে চিঠি লিখেছিলেন মহাশ্বেতাদেবী। —গ্রাফিক সনৎ সিংহ।

দ্বিতীয় পর্বের যে আবেদন তাতে মূখ্য ভূমিকা ছিল সংরক্ষণ স্থপতি আভা নারায়ণ লাম্বাহ এবং মণীশ চক্রবর্তীর। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং দেশের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের হয়ে শান্তিনিকেতনের জন্য দাবিপত্রটি তাঁরাই তৈরি করেন। এর পরে নিয়ম মেনে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের উপদেষ্টা সংস্থা আইকোমস (ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস)-এর পক্ষে শুরু হয় শান্তিনিকেতন পর্যবেক্ষণ। বিভিন্ন আবেদনের সত্যতা যাচাই করার পরে আইকোমস শান্তিনিকেতনের নাম সুপারিশ করে ইউনেস্কোর কাছে এবং বিনা বাধায় তা গৃহীত হয়। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের পক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডির তৎপরতাও ছিল। বিষয়টি নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। যদিও তিনি কোনও কৃতিত্ব নিতে অস্বীকার করে বলেন, “আমি কিছুই করিনি। অনেকে মিলে একটা বড় কাজ করছিলেন। আমি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়েছি। এর বেশি কিছু নয়। তবে শান্তিনিকেতনের এই সম্মান শুধু বাংলার নয় গোটা দেশের কাছে বড় গর্বের ।”

কিসের ভিতিতে ইউনেস্কোর কাছে স্বীকৃতি দাবি করা হয়েছিল? আভা নারায়ণ বলেন, “শান্তিনিকেতনে যে স্থাপত্য তা উপনিবেশ ধাঁচের নকল নয়। প্রাচ্যের আধুনিকতার হাত ধরেই রবীন্দ্রনাথ সারস্বত সমাজ ও সংস্কৃতি জগৎকে মিলিয়েছিলেন। আবেদনে এই বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছিল।” তিনি আরও জানান, শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ভবনে যে স্থাপত্য, চিত্রকলা, গৃহসজ্জা রয়েছে তার সঙ্গে মিলে রয়েছে কবির ভাবনা ও দর্শন। সেই সঙ্গে গোটা এলাকার প্রাকৃতিক বিন্যাসকেও ঐতিহ্য স্মারক হিসাবে আবেদন করা হয়েছিল। সবটাই ইউনেস্কোর শর্ত পূরণ করছে।” একই সঙ্গে তিনি বলেন, “অন্য পাঁচটা ঐতিহ্য স্মারক ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। এটি একটি সচল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে এখানে ঐতিহ্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জও বেশি। এখন বিশ্বভারতীর বাসিন্দা থেকে শান্তিনিকেতনের পড়ুয়া সকলেরই দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।”